কাঁধে কম্বল পায়ে চপ্পল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
৭ই জুলাই, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রক
কমল মিত্র
নব মুদ্রন
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

কাঁধে কম্বল পায়ে চপ্পল

এক

আমার বোন বলেছিল, কখনো ফুঁ দিয়ে বাতি নেভাস না ভাই

আমি বেরিয়ে এলুম। বাড়ি থেকে নয়, অফিস থেকে নয়, কারখানা থেকে নয়, রেস্তোরাঁ থেকে নয়, বেরিয়ে এলুম মাতৃগর্ভ থেকে। কী কষ্টে ছিলুম রে ভাই! নড়বার চড়বার উপায় নেই। ছোট্ট একটা পলিথিন ব্যাগ। তার মধ্যে খানিকটা জল ভরেছে। একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বললে, মা 'লাইফ-লাইন' সাপ্লাই করেছেন। মা যা খাচ্ছেন তুমি সেটি টানছ। আর তিলে তিলে তেএঁটে হচ্ছ। মাথাটা নিচের দিকে পা দুটো ওপর দিকে। মাছের ফাতনার মতো টাপুর টুপুর ভাসছি। মা যেখানে যায় আমিও সেখানে যাই। প্লাস্টিকের জল ভরা প্যাকেটে টুলুর টুলুর করতে করতে।

এ একধরনের কারাবাস। মেয়াদ নমাস থেকে দশমাস। কী অপরাধে? যাঁরা সব জানেন টানেন, তাঁর লিখে রেখে গেছেন, মানুষকে এই পৃথিবীতে বারে বারে আসতে হয়। এসে যা-তা কাজ করে। বিড়ি খায়, সিগারেট খায়। মেয়েদের সিটি মারে। মদ খায়, জুয়া খেলে। বউয়ের কথায় বাপ, মাকে দেখে না। বউকে জামদানি কিনে দেয়। মা ছেঁড়া শাড়ি পরে ঘোরে, দেখেও দেখে না। বাপ কেশে, কেশে মরে যায়। সাড়ে দশটাকা দিয়ে একটা কাফ মিক্‌শচার এনে দিতে পারে না। বিয়ের আগেই বউকে চুমু খায় নির্জনে। মিথ্যে কথা বলে। জাল, জোচ্চুরি করে। বিধবার সম্পত্তি নিজের নামে করে নেয়। ভাইকে ফাঁকি দেয়।

পাপ। এ সব পাপ। পাপ করলেই পৃথিবীতে আসতে হবে। ভগবানের দপ্তর হল একটা অতি উন্নত অলৌকিক ব্যাঙ্ক। কেউ নেই সেখানে। অথচ সবাই আছে। অদৃশ্য। বহু অদৃশ্য কম্পিউটার আছে। অবশ্যই মেড-ইন-জাপান। পৃথিবীতে যা যা আছে, সব ওখানে আছে। পৃথিবীটা হল জেরক্স কপি। অরিজিন্যাল ওখানে। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা দরকার। এটা হল বিজ্ঞানের বাবা—অতি বিজ্ঞান।

বোঝাবার চেষ্টা করি। একটু চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে। এখানে আমরা যাকে হরি বলে ডাকছি, সে আসলে জেরক্স কপি। আসল হরি, অর্থাৎ হরির ছাঁচ ওপরে আছে। এখানে যে কম্পিউটার রয়েছে, তার মাটা ওপরে আছে। সেই মা এখানকার মানুষের মাথায় ডিম পাড়ে। মাথার গরমে ডিম ফুটে পৃথিবীতে মালটা বেরোয়। যে-মাথা থেকে মালটা বেরোয়। সেই মাথার মালিকের নাম বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, এই সব। একটা ছোট জিনিসেব উদাহরণ দেওয়া দরকার। যেমন ফুচকা! ফুচকা আগে ওখানে তৈরি হয়েছিল। সেখান থেকে নেমে এল মহাজাতি সদনের পাশের গলির বাবুয়ার মাথায়। স্বপ্নে ডাক শুনল, 'আরে এ বাবুয়া উঠ্। এ লে!' বাবুয়ার

হাতে এসে গেল ফুচকার ফর্মুলা। মাটির হাঁড়িতে তেঁতুল গোলা জল কতটা লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে করতে হবে, তাও এসে গেল বাবুয়ার মাথায়। দশ বছরেই কোটিপতি। সম্বর্ধনা ও উপাধি দেওয়া হল তাকে ও তার স্ত্রীকে 'ফুচকা কিং', আর 'ফুচকা কুইন।' এই কদিন আগে সিঙ্গাপুরে গিয়ে খুলে এল 'ফুচকা পার্লার'। একটা বিউটি কন্টেস্ট করেছিল। ম্যালেশিয়ার একটি মেয়ে প্রথম হল,—'মিস্ ফুচকা'। থাইল্যান্ডের একটি মেয়ে রানার্সআপ—'মিস্ ইমলি'। 'মিস্ লঙ্কা' হল শ্রীলঙ্কার এক কিশোরী।

ভাব আর ভাবনা সব ওপরে। অনন্তের ঘরে। শিশিরে মতো অবিরত ঝরছে। পড়ছে মানুষের খুলিতে। মানুষ সেই অনুসারে কাজ করছে। কখনো ভাল কাজ, কখনো খারাপ কাজ। কেউ কারোকে খুনটুন করে এসে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আলুর চপ খেতে বসল। কেউ কোনো মহিলার ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে বুটের লাথি খেয়ে পরপারে চলে গেল। পরপার বলে কিছু নেই। ঘাস যে-মাটিতে জন্মায় সেই মাটিতেই মিশে যায়। গরুতে খায়। যতটা হজম করতে পারে ততটা সবুজ থেকে সাদা দুধ হয়ে বেরোয়। গরুর পেটে মনে হয় অনেক চুন থাকে। যেটুকু হজম হয় না গোবর হয়ে বেরিয়ে আসে। জ্বালানি হয়। ভাল সার হয়। চাষবাসে লাগে। দুধ থেকে দই, ছানা, রাবড়ি হয়। মানুষের পেটে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসে অকথ্য একটি পদার্থ হয়ে। সন্দেশের অভিযোগ—ছিলুম সুস্বাদু, আদরণীয়। বেটা মানুষ! তোমার পাল্লায় পড়ে আমার কি হাল হল! এক মহাপণ্ডিত প্রশ্ন করছেন, মানুষ! তুমি কি? তারপর নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, তাজ্জব এক যন্তর! কি কায়দায় শিরাজের বহুমূল্য দামী মদকে পেচ্ছাপে পরিণত করো।

জ্ঞান-ট্যান হওয়ার পর মাঝেমাঝেই শুনতুম—ছেলেটার এমন কপাল, এক মিনিট আগে এলে ভাগ্যের রেল-গাড়িটা পেয়ে যেত। এসব জ্যোতিষীদের কথা। গাছ-কোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। এতটাই লম্বা যে বড় গাছের মগডালে বসে খুললে মাটিতে লুটোবে। চিত্র-বিচিত্র ব্যাপার। খুব কৌতূহল হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলুম—'কাকাবাবু! এক মিনিট আগে এলে কি হত?'

'চূড়ামণি যোগটা পেয়ে যেতিস। রাজা হতিস।'

'কী যোগ তাহলে পেলুম?'

'কাল সর্প যোগ।'

'মানে কাল সাপে কামড়াবে?'

'অনেকটা তাই। রোজগার টোজগার থাকবে না। তিনটে 'অ'। অভাব, অসুখ, অশান্তি।'

'বড়লোকের মেয়েকে যদি বিয়ে করি! ঘরজামাই। বাড়ি, গাড়ি!'

'এক মিনিট আগে এলে তাই হত। তুমি যখন এলে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। প্রেমে পড়বে। বিয়ে করবে সাংঘাতিক দজ্জাল একটা মেয়েকে।'

'তার ভাগ্যেই খাব।'

'অবশ্যই খাবে। উঠতে-বসতে খাবে। ঝ্যাটা আর গালাগাল।'

'আমাকে গাল দিলে আমিও দেবো।'

'পারবে না। তুমি স্ট্রেন হবে। জরুকা গোলাম। পড়ে পড়ে মার খাওযার জন্যেই তোমার জন্ম। যদি ঘড়িটা দেখে আসতে ট্রেনটা পেয়ে যেতে!'

'লেখাপড়া হবে?'

'কষ্টে-সৃষ্টে। ফার্স্ট ডিভিসান, লেটার, স্কলারশিপের আশা করো না।'

'কাকাবাবু। আত্মহত্যা করে ফের এগেন জন্মাব?'

'এত আগে জোর করে আত্মহত্যা করবি কেন? আত্মহত্যার যোগ ত রয়েইছে। আটত্রিশ বছর বয়েসে। তখন দড়ি তোকে নিজেই টেনে নেবে। দুলতে দুলতে আসবে। ভোর রাতে ঘুম ঘুম চো'খে ঝুলে পড়বি। সকলে হলে লোকে দেখবে—পেণ্ডুলাম দুলছে। সব সময়ে হবে বাবা! তাড়াহুড়োর কী আছে! ধৈর্য ধরো।' জ্যোতিষীর কথা বেশি দিন কে আর মনে রাখে। ওসব সুখী বড়লোকদের বিলাশ। দুহাতের আঙুলে দামী দামী ছটা আংটি। জ্যোতিষী ফোনে ফিট করা আছে। 'কী হল মশাই টেন্ডারটা ত লাগল না। অত বড় একটা কাজ দত্ত ব্রাদার্স মেরে দিলে।'

গ্রহাচার্য বললেন, 'মিত্তির মশাই আগেই বলেছি, সবচেয়ে বড় গ্রহ হল রাজনীতি। দত্তর কানেকসানটা একবার দেখুন। আপনার সাবেক চালে যা হবার তাই হচ্ছে। সবই যেত ওই হিরেটার জোরে চলছে। ঘাবড়াবেন না! বৈশাখে বিরাট একটা যোগাযোগ হবে।'

গ্রামে আমার বাবার একটা ফার্ম হাউস ছিল। বেশ বড়ই। আমার বিজ্ঞানী বাবা নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। অনেক আগেই তিনি 'হাইব্রিড' তৈরি করেছিলেন। বাড়াবাড়ি প্রচার অপছন্দ করতেন। বলতেন, 'আমি ত ব্যবসা করব না। আমি গবেষণা করি খুঁজে পাওয়ার আনন্দে। স্রষ্টা কত কী লুকিয়ে রেখেছেন। মানুষ! তুমি খুঁজে বের করো। 'বার কয়েক বিলেতে গিয়ে পেপার পড়ে এসেছেন।

আমি হাঁ করে আমার বাবাকে দেখতুম। কী করে এমন সুন্দর হলেন। টকটকে ফর্সা। সুন্দর মুখ, চোখ, খাড়া নাক। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। চওড়া কাঁধ, চওড়া বুক। রোজ ব্যায়াম করেন। মুখে সব সময় সুন্দর একটা হাসি। কখনো রাগেন না। মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম. মা, আমার বাবার মতো বাবা তুমি আর কোথাও পাবে?' মা বলতেন, 'কেন? আমার বাবা! তোর বাবার চেয়েও সুন্দর।'

সে কথাটাও ঠিক। আমার দাদু ছিলেন রেলের বড় ইঞ্জিনিয়ার। বাবার চেয়েও লম্বা। আরো খাড়া নাক। বড় বড় চুল। রেশমের মতো চকচকে। একেবারে সাধুর মতো দেখতে। উত্তর ভারতের পাহাড়ে, জঙ্গলে, কোথাও রেল লাইন পাতছেন, কোথাও ব্রিজ তৈরি করছেন, কোথাও কালভার্ট। মাটিতে খড় বিছিয়ে, তার ওপর পাহাড়ী কম্বল বিছিয়ে শীতকালে যখন ধ্যানে বসতেন, মনে হত মহাদেব নেমে এসেছেন কৈলাস থেকে। ওইটাই হত তাঁর বিছানা। শীত গ্রীষ্ম মাটিতেই শুতেন।

ভেতরে একজন সাধু ছিলেন। কথা কম বলতেন। কিন্তু ভারি সুন্দর গল্প বলতেন। পাহাড়ের গল্প, জঙ্গলের গল্প। চাঁদের আলোর রাতে পেছন দিক থেকে একটা ভাল্লুককে যেতে দেখে ভেবেছিলেন, স্যুট পরে সিম্পসন সায়েব যাচ্ছেন। ডাকছেন, সাড়া নেই। অনেকটা কাছে গিয়ে দেখেন ভাল্লুক। দাদুর ভয়-ডর ছিল না। নিজের ঠোঁট থেকে বর্মা-চুরুটটা খুলে ভাল্লুকের ঠোঁটে গুঁজে দিলেন। ভাল্লুকটা টানতে টানতে পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

আমাদের বাড়ির সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা ছন্দ ছিল, একটা আনন্দ। বাবা বলতেন, খাতায় লিখে রাখো আন্ডার লাইন দিয়ে, জীবনে তিনটি জিনিসের সাধনা করবে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চরিত্র। টাকা, পয়সা, যশ, খ্যাতি তখন আপনি আসবে। নীল আকাশে চাঁদ উঠলে চাঁদের কিরণ আসবেই। রাত নটা থেকে দশটার মধ্যে খাওয়া শেষ। তারপর আমরা সদলে বেরিয়ে পড়তুম ভ্রমণে। দলটা বেশ বড়ই হত। দাদু, জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা, বাবা, মা, আমি, আমাদের বাড়ির কাজের দাদা, হরিদা আর মণিদি। বীরভূমে বাড়ি ছিল। সত্যিই বীর। যে-কোনো বিষাক্ত-সাপ খপ করে ধরে ফেলতে পারে। জীব-জন্তুর কথা পরিষ্কার বুঝতে পারে। নাচতে জানে, গাইতে জানে। সুন্দর গলা। আমাকে আর আমার দিদিকে খুব ভালবাসে, তাই খুব শাসনও করে। মণিদিকে আমরাও খুব ভালবাসি। সাদা শাড়ি সাদা ব্লাউজ। রেশমের মতো চুলের ঢল। চাঁদের আলোর রাতে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হবে, আকাশ থেকে পরী নেমে এসেছে বুঝি!

সেই যে পথ! সেটা যেন আমার মনের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে চলে গেছে। হাঁটছি, আজও হাঁটছি। তেমন প্রশস্ত নয়। দু'পাশে নির্জন, নির্জন বাগান বাড়ি। বাবুরা কলকাতায় থাকেন। ছুটি কাটাতে মাঝে মাঝে সপরিবারে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসেন। তখন দোতলার হলঘরে ঝাড়বাতির রোশনাই। কর্মচারীদের দৌড়-ঝাঁপ। নানা কণ্ঠস্বর। হাসি, গান। নতুন, নতুন মুখ। কর্তারা ডাকছেন, দীনু, দীনু। পরেশ, পরেশ। কাপ-ডিশের শব্দ। রান্নাঘর ধোঁয়া ছাড়ছে। মাংস রান্নার সুগন্ধ। ঝাঁকা ভর্তি মুরগি ঢুকছে কঁ্যাক, কঁ্যাক শব্দে। গেট দিয়ে সাইকেল ঢুকছে বিশাল বাজার নিয়ে। এ-সব সকালের দৃশ্য। সুখের ছবি। কয়েকদিন পরেই সব ভোঁ ভাঁ। বাবুর্চি, রাঁধুনি বাবুদের সঙ্গে বিদায়। স্থানীয়রা পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে ফিরে যাবে। সঙ্গে পোঁটলা পুঁটলি। পড়ে থাকবে বাগান। দারোয়ান, নালি। একজন ম্যানেজার। চতুর্দিকে ফুল। নিশ্চিন্তে, ভাসমান, নানা রঙের প্রজাপতি। গান গাওয়া পাখিদের জলসা। হলুদ বাড়ি, সাদা বাড়ি। ইট রঙের বাড়ি। বড় বড় গেট। ইট বাঁধানো পথ। রাতে সব অন্ধকার। দেউড়িতে একটি মিটমিটে বাতি। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। অন্ধকারে বাদুড়ের চক্কর।

বড় বড় লোকদের বড় বড় জীবন দেখতে বেশ লাগে। ওই পথ ধরে যেতে যেতে আমরা এক সময় পৌঁছে যেতুম গঙ্গার ধারে। বিশাল মাঠ, বিরাট সেই অশ্বত্থ গাছ। বাঁধানো বেদি। বহু পুরনো কালের শিবমন্দির। বিষ্ণুপুরী স্থাপত্য। বিশাল শিবলিঙ্গ।

চোখের সামনে চওড়া গঙ্গা। পাড় ঢালু হয়ে গড়িয়ে জলে গিয়ে নেমেছে। তিন চারটে জেলেডিঙ্গি খোঁটায় বাঁধা। দোল খাচ্ছে। জলের ছলাৎ, ছলাৎ শব্দ। ওপারে বিশাল জুট মিল। গঙ্গার ধারে অফিসারদের কোয়ার্টার। টানা বাগান। আলোর মালা দিয়ে স্বপ্নের মতো সাজানো। নানা রঙের গার্ডেন আমব্রেলা। তার তলায় টেবিল, চেয়ার। বসার ব্যবস্থা। প্রায়ই পার্টি হয়। আমরা এ-পার থেকে দেখতে পাই পরিষ্কার। বার বি কিউ হচ্ছে। কাঠকয়লার আগুনে একটু একটু করে ঝলসে যাচ্ছে মসলা মাখানো মুরগি। অতি স্বাদু। জোনাকির মতো মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে আগুন-চূর্ণ। বাতাস যখন এ-পারের দিকে বইছে তখন কানে আসছে ইংরিজি গান। সেই সময় বড় বড় জুটমিল আর চা-বাগানে অনেক সায়েব থাকত। তখন ত সায়েবদেরই রমরমা। ক্ষমতায় থাকলে মানুষের কেমন জৌলুস বাড়ে!

এ-পারটা যেন একশো বছর পেছনে পড়ে আছে। মাথার ওপর বেগুনী আকাশ। অশ্বত্থ গাছের থোকা থোকা পাতা চামরের মতো ঝুল ঝুল করছে। ভগবান যেন ছবি এঁকেছেন। শিব মন্দিরের চূড়ায় রোজই একটা সাদা পেঁচা এসে বসে। মানুষের মতো মুখ। কলের পুতুলের মতো মুণ্ডু ঘোরায়। মণিদি বন্ধ শিব-মন্দিরের সামনে নির্জন অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। 'কী দেখো তুমি?' প্রশ্নের উত্তরে খিল খিল করে হেসে বলে, 'কত কী ? আমার অন্ধকার দেখতে ভাল লাগে। অন্ধকারে অনেক কিছু থাকে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ।'

'কী থাকে গো? ভূত?'

'না, আমাকে এক মস্ত বাউল বলেছিলেন, অন্ধকারেই মহাদেব থাকেন। মায়ের পেটেও অন্ধকার, যখন মরে যাব তখনও অন্ধকার।'

মণিদি অসাধারণ গান গায়। গলায় কী সুর যেন প্রতিমা মুখোপাধ্যায়। গান ধরল,

গঙ্গা ম'ল জল-পিপাসায়,
অগ্নি ম'ল শীতে রে।
জলের মধ্যে পাখির বাসা
গাছের মাথায় ডিম রে॥
উত্তরে তার শিয়রখানি
দক্ষিণে তার পা রে।
পূর্বদিকে হাত দু'খানি
পশ্চিমে কয় কথা রে॥

একদিকে সাদা সাদা ফুলে ভরা গুলঞ্চ গাছ। কাঠচাঁপা। টগর। শ্বেত করবী। মহাদেব যে সাদা ফুল ভালবাসেন। ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা চারপাশ। অন্ধকার আকাশে টকটকে তারা। মণিদির পাশে মা আর বড়মা এসে দাঁড়িয়েছেন। তিন জনেই গাইছেন, গঙ্গা ম'ল জল-পিপাসায় / অগ্নি ম'ল শীতে রে। অত রাতেও আমার বোনটা পাখির ডানার মতো হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে পরীর মতো সারা মাঠে উড়ে

বেড়াচ্ছে। বাবা আর জ্যাঠামশাই লম্বা লম্বা পা ফেলে সৈনিকদের মতো মার্চ করছেন। মাঝে মাঝে হা হা করে হাসি।

একেবারে উত্তরে সবচেয়ে নির্জন যে-জায়গাটা, গঙ্গার ওপরে প্রায় ঝুলছে, যে কোনোদিন ধস নেমে যাবে। সেইখানে অদ্ভুত একটা ঘর। কংক্রিটের বাক্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈন্যরা এই জায়গাটার দখলদারি নিয়েছিল। গঙ্গায় সার সার ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট। মেশিনগান ফিট করা। মাঠের দু পাশে দুটো বিমান মারা কামান। পর পর কয়েকটা বাংকার তৈরি করেছিল। ওই একটা এখনও আছে। তার পরেই দু'মানুষ উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের আড়ালে বিরাটের চেয়েও বিরাট একটা বাগান। কারো ঢোকার উপায় নেই। তিন-চারটে পেল্লায় পেল্লায় কুকুর ছাড়া আছে। কী তাদের ডাক! আমরা নাম রেখেছি, রহস্য রোমাঞ্চ। ভেতরে খুব কায়দার তিনতলা বাড়ি। একদিন দেখেছিলুম, তিনতলার চিলেকোঠার ছাতে সাদা আলখাল্লা পরে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। প্রদীপ-শিখার মতো স্থির। কত লম্বা। বড় বড় সাদা ধবধবে চুল, দাড়ি। চাঁদের আলোয় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। তীব্র আলো। বই পড়া যায়। গঙ্গা হয়ে গেছে কাচের খণ্ড। মাঝ-দরিয়ায় ভুবনবাবুর পানসি। শিল্পী মানুষ। খুব বড়লোক। বাঁশি বাজাচ্ছেন। এত দিনে একদিন দেখেছিলুম। আর একটা অলৌকিক ব্যাপারও দেখেছিলুম সেদিন। কোথা থেকে ডানার ফটফট শব্দতুলে তিনটে সাদা পায়রা উড়ে এল। দুটো বসল সেই মানুষটির দু-কাঁধে। তৃতীয়টা বসল মাথায়। রাত্তির বেলা পায়রা। কংক্রিটের ঘরে আলো জ্বলছে। লণ্ঠন। বাতাসে কাঁপছে। একবার আমাদের যেতেই হবে। চারপাশ তকতকে পরিষ্কার। পরিষ্কার তুলসী-মঞ্চ। মাটিতে খইয়ের মতো সাদা সাদা ফুল ছড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর থেকে সিল্কের সুতোর ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

দুই

সিতারোঁ সে আগে জহাঁ অওরভী হ্যাঁয়
অভী ইশককে ইমতহাঁ অওর ভী হ্যাঁয
তেহী জিন্দগীসে নহী ইএহ্ ফিজায়েঁ
ইহাঁ সেঁকড়ো কারোয়াঁ অওর ভী হ্যাঁয় [ইকবাল]

কংক্রিটের ওই বাক্সঘরে অদ্ভুত এক মানুষ থাকেন। তাঁর নাম অপু ঠাকুর। ফর্সা ধপধপে গায়ের রঙ। যেন রাজপুত্তুর। ঘরের দেয়ালে একটা একতারা ঝুলছে। একদিকে সুন্দর একটা বেদী। অপূর্ব রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। শ্রীকৃষ্ণ হাসি হাসি মুখে ঠোঁটের কাছে বাঁশিটি ধরে আছেন। আমার কেমন ধারণা, গভীর রাতে ওই বাঁশির

সুর শোনা যায়। আর একপাশে দেয়ালে খাড়া করে রাখা আছে, হাতা, খুন্তি, ঝাঁজরি। ঝকঝকে। একসঙ্গে বাঁধা। একটি গাঁদাফুল দিয়ে পুজো করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে চন্দনের গন্ধ। ফুলের গন্ধ। মেঝেতে পরিপাটি করে একটি মাদুর পাতা।

অপু ঠাকুর ডাকসাইটে হালুইকর। বড়লোকদের বাড়ির কাজে অপু ঠাকুর বাঁধা। একসঙ্গে দু বাড়িতে কাজ হলে অপু ঠাকুরকে পাওয়ার জন্যে যে কোনো একটা বাড়ি তারিখ পরিবর্তন করে। আমরা ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করলুম। ধীরে সসম্ভ্রমে। ঠাকুরের পুজো এই সময় শেষ হয়। পুজো মানে বিগ্রহের সামনে বসে অঝোরে কান্না। কোনো কোনো দিন একতারা বাজিয়ে গান। আমরা একদিন গভীর রাত পর্যন্ত গান শুনেছিলুম। কী অসাধারণ গলা! একবার শুনেই গানটা আমার মনে লেখা হয়ে গিয়েছিল,

গুরু দয়া কর মোর গো, বেলা ডুবে এল।
তোমার চরণ পাবার আশে রইলাম ব'সে, সময় বয়ে গেল॥
আমি অমূল্য ধন লয়ে হাতে ভবে এসেছিলাম ব্যাপার ব'লে।
ছয়জন বোম্বেটে জুটে আমায় পথ ভুলায়ে সে ধন লুটে নিল॥

সেদিন আমার চোখেও জল এসেছিল। ছেলেবেলা থেকেই কিছু কিছু শব্দ আমাকে কাঁদায়। ভীষণ একা লাগে। একা একা চলেছি, ঝরা পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন পথে। স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার। বড় বড় গাছ। মোটা মোটা গুঁড়ি। চারপাশে কুয়াশা নামছে। একটা বড় গাছের উঁচু একটা জল। সাদা একখণ্ড কাপড় ঝুলছে। কেউ যেন আমাকে ইশারায় ডাকছে, আয়, চলে আয়। যে-শব্দটা আমাকে ওই অবস্থায় নিয়ে যায়, সেটি হল, বেলা ডুবে এল। বেলা বয়ে গেল। সূর্যাস্তের আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়। আমি বেশি দিন বাঁচব না। অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে আমার ঘর আছে। নদীর ওপারে, পৃথিবীরও পারে। সেখানে তারে আমার ধুতিটা শুকোতে দিয়েছিলুম, সেটা আজও ঝুলছে। আমি চলে এসেছি কে তুলবে! টেবিলের ওপর উপুড় করা বই। পাশে চশমাটা পড়ে আছে। চটি দুপাটি। বাতি জ্বলে জ্বলে গলে গেছে। শূন্য বাতিদান। কেন জানি না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ কেবল এ-পার, ও-পার করে। ওপারে মরে, এ-পারে আসে। আবার এ-পারে মরে ও-পারে যায়। কেন আসে এইসব চিন্তা! এই বয়েসে! একটুও ইচ্ছে করে না বাঁচতে।

অপুদার মুখে সেই মিষ্টি হাসি, 'আসুন, আসুন। আমার বড় মা, আমার ছোট মা। বসুন, বসুন। আজ নতুন কায়দার একটা রান্না শেখাব। মুড়কি ধোসা।' এঁরা পরস্পর পরস্পরকে রান্না শেখান, গান শেখান। সেলাই শেখান। আবার আঁকাও শেখান। জীবনকে কত ভালবাসলে এমন আনন্দে বাঁচা যায়।

অপুদার একটা কাবলি বেড়াল আছে। সাদা। দুধের মতো। ইয়া মোটা লেজ। বড় বড় লোম। ছোট্ট মিষ্টি মুখ। গোল গোল চোখ। মিষ্টি ডাক। মণিদি বসামাত্রই কোলে এসে উঠবে। শুরু করবে আদুরে ঘড়ড় ঘড়ড় শব্দ। অপুদাকে বলে দেয়াল

থেকে একতারাটা নামিয়ে আনলুম। ঘরের পেছন দিকে গঙ্গার ধারে নেমে গেলুম। জলের ওপর দোল খাচ্ছে সত্যদার নৌকো।

এই একটা মানুষ। সারাদিন শুধু নদীর কথা ভাবে। নদীর জল দেখে। জলের রং দেখে বলে দেয়। আর কদিন পরেই ভারি বৃষ্টি হবে। স্রোত বোঝে। বলে দিতে পারে, কোন টানে মাছ বেশি পড়বে। জলের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারে, অসুখের কাল এল, এবার রোগবালাই বাড়বে। বলে দিতে পারে, দেশে সুসময় আসছে না দুঃসময়। সত্যদাকে সবাই খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। বিপদে পরামর্শ নিতে আসে। সত্যদার কাছে অনেক রকমের টোটকা ওষুধ আছে। সাধুর পোড়ো ভিটের মাটি। বিদ্যুতের জল। হোমের ভস্ম। দুধ দিয়ে মাখা ; যেন সাদা ধবধবে নারায়ণ শিলা। সাদা শালগ্রাম। বিদ্যুতের জল কেউ জীবনে শোনেনি। অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। মাঝ গঙ্গায় নৌকো। সত্যদা বসে আছেন নৌকোয়। মাথার ওপর ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। মুহূর্তের জন্যে চারপাশ নীল। হয় ত কয়েক সেকেণ্ড। সেই সময়ে বৃষ্টির জল একটি তামার পাত্রে ধরতে হবে। তারপর রাখতে হবে নীল কাঁচের শিশিতে। চরণামৃতের মতো এক চামচ জল খাইয়ে দিলে মরণাপন্ন মানুষ সুস্থ হয়ে উঠবে। পোড়ো ভিটের মাটি মাদুলিতে ভরে হাতে পরলে বিপদ কেটে যাবে। অবস্থা ফিরবে।

আমরা যাকে বলি দুঃখ সত্যদা তাকেই বলে সুখ। ব্রাহ্মণের ছেলে। বাবা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত। জমিদারের কালীমন্দিরের নিত্য পূজারী। বহু বড়বড় যজমান। পয়সার অভাব ছিল না ; কিন্তু স্বভাবটা ভারি মন্দ হয়ে গেল। কালীবাড়ির পেছন দিকে জমিদাররা নিজেদের স্বার্থেই একটা বস্তি হতে দিয়েছিল। টিনের চাল। খড়ের চাল। সেখানে যত খেটে খাওয়া মানুষের সংসার।

পার্বতী। বিখ্যাত নাম। স্বামী, ফেরারী আসামী। একটা লোককে খুন করে পার্বতীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। সেই পার্বতীর ফাঁদে পড়লেন সরল ব্রাহ্মণ। তিনি পতিত হলেন। মন্দিরে পুরোহিতের কাজ লেগ। যজমানী গেল। সংসার গেল। তিনি চলে এলেন পার্বতীর কাছে। পার্বতী মনে হয় প্রকৃতই ভালবেসেছিল এই ব্রাহ্মণকে। প্রথমে যতটা হইচই হয়েছিল ততটা আর রইল না। একটা ব্যাপার নিয়ে কত দিন আর মেতে থাকা যায়! শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা পরে এমন কথাও বললেন, ব্রাহ্মণ পুরুষ নীচুঘর থেকে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। অসবর্ণ বিবাহ তার পক্ষে দোষের নয়। এই অপরাধে তার পতিত হয়ে যাওয়ারও কথা নয়। তবে ব্রাহ্মণ কন্যা নীচজাতীয় পুরুষকে বিবাহ করলে, সে নরকে যাবে।

আমরা তখন ক্লাস টেনে পড়ি। গলার স্বর হঠাৎ ভারি হল। সবাই বললে, বয়সা লেগেছে। মানে, শৈশব পেরিয়ে যৌবনে ঢুকল খোকা। ঠোঁটের ওপর অল্প অলক্ষ্ম গোঁপের রেখা। আমাদের সঙ্গে বিকাশ বলে একটি ছেলে পড়ত। মহা পাকা। সে আমাদের যৌন-জ্ঞান দিত। অজানা এক জগতের জ্ঞান। দাদা, বউদির মিলনদৃশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। মর্নিং সেকসানের রেবা সম্পর্কে তার গবেষণা। তার দেহের

সৌন্দর্য। কোমর, বুক, নিতম্ব। বিকাশ লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল। কিন্তু ওইরকম। যা খুশি তাই করত। ফসফস করে সিগারেট খেত। বেপরোয়া ছেলে।

অস্বীকার করার উপায় নেই বিকাশ আমাদের পাকিয়ে দিয়েছিল। আমাদের পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়েছিল। একদিন নির্জন দুপুরে মহাভারতের একটা অংশ পড়ে শোনাল। অর্জুনসমীপে কামপীড়িতায়া উর্বশ্যা গমনম্॥ ব্যাখ্যা করে করে পড়তে লাগল। উর্বশী অর্জুনের কাছে চলেছেন। কাম জেগেছে। অর্জুনের রূপের কথা শুনেছেন। মন কামবাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইতেছিল, তাই সে কামপীড়িতা হইয়া স্নানের পর মনোহর অলঙ্কার ও সুন্দর গন্ধ মাল্য ধারণ করিল ; তখন তাহার মন অন্য পুরুষের দিকে না যাওয়ায় মনের সঙ্কল্প অনুসারে সে যেন সতী স্ত্রীর মতই সুচিত্তা ছিল ; আর দিব্য আস্তরণে আবৃত এবং বিস্তৃত শয্যার উপরে অর্জুন যেন আসিয়াছেন, সে যেন তাঁহার সহিত রমণ করিতেছে। মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিল। এই অবস্থায় বিপুলনিতম্বা উর্বশী চন্দ্রোদয় হইলে সম্পূর্ণ প্রদোষকালে আপন গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অর্জুনের গৃহের দিকে প্রস্থান করিল।

পরমশোভিতা উর্বশী যখন গমন করিতেছিল, তখন তাহার কোমল, কুঞ্চিত, দীর্ঘ ও পুষ্পমালাধারী কেশকলাপ ঝুলিতেছিল। তাহার স্তন দুইটি লাফাইতেছিল। সেই সুন্দরমুখ স্তন দুইটি দিব্য অঙ্গরাগে ও দিব্য চন্দনে রঞ্জিত ছিল এবং হার সংস্পর্শে অতি মনোহর হইয়াছিল।

সেই স্তনযুগলের ভারে সে সমস্ত পথই অবনত হইয়া চলিতেছিল। শরীরের মধ্যভাগ ত্রিবলীর গুণে আশ্চর্য হওয়ায় সে অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল। তাহার নাভির নিম্নভাগ শুভ্র পর্বতের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিতম্বযুগলদ্বারা উন্নত, স্থূল এবং কাঞ্চীদামে অলঙ্কৃত হওয়ায় কামের আয়তন হইয়াছিল।

বিকাশ বললে, 'জ্যান্ত উর্বশী দেখবি?'

আমার কান, মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। বললুম, 'কোথায়?'

'বলবি না কারোকে।'

সবে সন্ধে হয়েছে। অন্ধকার বেশ কিছুটা গাঢ় হতে বিকাশ বললে, 'চ'।

সেই বস্তী। সরু সরু গলি। ঘুরপাক খেতে খেতে একটা চালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম! ঘরের ভেতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। এক মহিলা একটা আয়নার সামনে বসে সাজছে। বিকাশ দরজায় একটা শব্দ করতেই মহিলা ফিরে তাকাল, 'এসেছিস? এনেছিস?'

বিকাশ আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'এনেছি।'

'দরজাটা বন্ধ করে দে।'

দরজা বন্ধ করে, বিকাশ পকেট থেকে একটা হার বের করে মহিলার হাতে দিল। তালুতে রেখে দু-চারবার নাড়ানাড়ি করে মহিলা বললে, 'এ যে অনেক!'

নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে বিকাশকে জাপ্টে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেললে। একবার

বললে, 'ওই ভূতটাকে কোথা থেকে ধরে আনলি।'

আমি দরজা খুলে ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে এলুম। এই সেই পার্বতী। প্রকৃতই জ্যান্ত উর্বশী। আমার কান্না পেল। এত সুন্দরী ; কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যে কি সব বিশ্রী কাজ করতে হচ্ছে। বিকাশটা একেবারে উচ্ছন্নে গেছে। সোনার হার! নিশ্চয় চুরি করেছে। পার্বতী বেশ্যা। গঙ্গার ধারে বটতলায় বসে প্রতিজ্ঞা করলুম. বিকাশের সঙ্গে আর মিশব না।

সত্যদা এই পার্বতীকে মা বলে গ্রহণ করতে পারেনি। সব ছেড়ে ছুড়ে নিজের জীবনকে সে নিজের মতো করে লিখেছে। আমার হাতে একতারাটা দেখে বললে, 'বাজালেই জলে ফেলে দোবো।'

'কেন গো? আমি যে তোমাকে বাউল গান শোনাব!'

'বাউল ছাড়া বাউল গান হয় না। ভদ্দরলোক বাউলের কি বোঝে? বাউল ধর্মে, জীবনে বাউল। তারা মাটির কাছাকাছি থাকে। তাদের জীবন কঠিন জীবন। গানই তাদের সাধনা। শান্তিতে বসতে পারিস বোস। গঙ্গার গান শোন এই ভরা চাঁদের রাতে, নয় তো চলে যা।'

একতারাটা কোলে নিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। সত্যদা ঠিকই বলেছে। অনাধিকার চর্চা উচিত নয়।

সত্যদা খুব জোরে জোরে বিড়ি টানছিল। পোড়া বিড়ির শেষ টুকরোটা অন্য কেউ হলে জলে ফেলত। সত্যদা একটা ডিবেতে রাখল। ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, 'এখানে তিনজন আছে, তিনজনই মেয়ে।'

'তার মানে?'

'তিনটি মেয়ে এই জলে আত্মহত্যা করেছিল।'

'তারা কারা?'

'প্রথমে আমার মা। বাবা বলেছিল, তুমি জলে ডুবে মরো। দ্বিতীয়জন বৃন্দাবনের বড় মেয়ে। কটা বদলোক তার ইজ্জত নষ্ট করেছিল। তৃতীয়জন এই বাগানবাড়ির ছোট বউ। এই তিনজনই জল থেকে উঠে আসে।'

'ভূত-প্রেতে আমি বিশ্বাস করি না।'

'সে তুই দেখিসনি তাই বিশ্বাস করিস না। যে-কোনো অমাবস্যার রাতে এই নৌকোয় বসে রাত কাটাবি আমার সঙ্গে, দেখবি অশরীরীদের খেলা। পৃথিবীর মায়া তারা ছাড়তে পারেনি। আমার মায়ের মৃত্যুটা শুনবি? সেদিন খুব ভাল রান্না হয়েছিল। আমি যা-যা খেতে ভালবাসি, সেই সব রেঁধেছিল আমার মা। বাগদা চিংড়ি। বড় বড় পার্সে। আমের চাটনি। মায়ের হাতের বিখ্যাত রান্না, ভাজা মুগের ডাল। পোস্ত দিয়ে লাউশাক। আমি চান করে এলুম। মা আমাকে খেতে বসালেন। থালার চারপাশে সাজিয়ে দিলেন বাটি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, মা! আজ এত খাতির

কেন? মা বললেন, ভুলে গেলি, আজ যে তোর জন্মদিন। তুই ধীরে ধীরে খা, আমি চট করে এক ঘটি গঙ্গাজল নিয়ে আসি। মা আর ফিরে এল না। ঘাটের সিঁড়িতে রাখা ঝকঝকে ঘটিটা ফিরে এল। এক ঘটি গঙ্গাজল। তিন দিন পরে মা ভেসে উঠলেন বালির ঘাটে। সেই লোকটাকে আমি খুন করতুম ; কিন্তু হঠাৎ মারা গেল। মরে বেঁচে গেল।'

মাঝগঙ্গা দিয়ে একটা স্টিমার যাচ্ছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। কারা সব বসে আছে। ভোঁ ভোঁ করে বাঁশি বাজাল তিনবার।

বাড়ি ফিরে এলুম। দাদু জেগে আছেন। পড়াশোনা করেন প্রায় সারা রাত। দিন ছোট হয়ে আসছে, যতটা পারি জেনে যাই। ফিরে গেলেই ভগবান পড়া ধরবেন। এই তাঁর কথা। আমাকে বললেন, 'বোস! একটা কিছু লিখে ফেলেছি। পড়ে বলত কেমন হয়েছে?' খাতাটা এগিয়ে দিলেন। দাদু লিখছেন,

'নদী কখনও কাঁদে, কখনও হাসে,
কখনও তার নাভিদেশ থেকে ওঁকার ধ্বনি ওঠে।
নদী ডাকে আয় চলে আয়।'

এই শহরের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেছে। আসছে অনেক ওপর থেকে। চলেছে সাগরের দিকে। সাগরে লীন না হতে পারলে নদীর শান্তি নেই। জীবনের মতো। মৃত্যুর কোলে গিয়ে উঠতেই হবে। এত কোলাহল, নর্তন, কুর্দন, আস্ফালন, তেলানো, শাসানো, প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ, নাচতে নাচতে জীবন চলছে সেই একই দিকে। মৃত্যু-মহাসাগরে। নদীর দানে সাগর পবিত্র। বহু ভক্তের পদ-রজে যেমন তীর্থ। 'সাগরে সর্বতীর্থানি।' আমাদের আচমনের মন্ত্রটিও ভারি সুন্দর :

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

সেই শৈশব থেকে নদীর তীরে আমার বসবাস॥ একটি পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের দিকে। এক সময় এই অঞ্চলে ছিল বড় বড় লোকের বাগানবাড়ি, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। প্রাচীন মন্দির। বিশাল বটবৃক্ষ। শিকড়ের জটলা নেমে এসেছে মহাসাধকের জটাজালের মতো। রানী রাসমণির কালীবাড়ি আর এই কালীবাড়িটি সমবয়স্ক। বারাণসীর শিল্পী একটি পাথর থেকে মায়ের দু'টি মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। একই নৌকোয় চেপে মূর্তি দুটি এসেছিল। এক মা নামলেন দক্ষিণেশ্বরে। আর এক মা নামলেন এই মন্দিরটিতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরকে পরিণত করলেন মহাতীর্থে। তাঁর লীলামৃত কথামৃত হয়ে যুগের পারে ভেসে এল পাল তোলা নৌকার মতো।

তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্ কবি ভিবীডিতং কল্মষাপহম।

এই নদীর মত আর এক প্রবাহিত নদী। একটু উজানে হালিশহরে রামপ্রসাদ, আর একটু উজানে শ্রীচৈতন্য। এগোতে এগোতে প্রয়াগ, বারাণসী, হরিদ্বার ছাড়িয়ে

একেবারে গোমুখী।

সে যুগের বাগানবাড়ির স্বতন্ত্র একটা গাম্ভীর্য ছিল। জলের কিনারা ঘেঁষে পোস্তা উঠেছে। কয়েকটি জলটুঙ্গি। এলিয়ে থাকা সবুজ একটি ভূখণ্ড। ধারে ধারে দেবদারু, কদম, শিরীষ, অর্জুন। আলো আর ছায়া মিশে জীবনমৃত্যুর মতো একটা রহস্যময় পরিবেশ। দোতলায় পশ্চিমমুখো প্রশস্ত ছাদ। সামনে তর তর করে বয়ে চলেছে গৈরিক জলধারা। ওপারের আকাশ তুঁতে নীল। তারই গায়ে লেপ্টে আছে হরিত বৃক্ষ, ধূসর মন্দিরের চূড়ো।

আভিজাত্য জিনিসটাই যুগের সঙ্গে লোপাট হয়ে গেছে। মানুষ আছে তবে মানুষের আর সে চেহারা নেই। সেই হাঁটা চলার ভঙ্গি, সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গি, সেই কথাবলার ধরন। অনুচ্চ কণ্ঠ। প্রতিটি শব্দের কি ওজন! জলটুঙ্গিতে হলুদ শাড়ি পরে সুন্দরী এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, সূর্যের লাল গোলক পৃথিবীর পরপারে যাবার জন্যে পশ্চিম আকাশে নেমে এসেছে। এখুনি যেন জলস্পর্শ করবে! ছ্যাঁক করে বুঝি শব্দ হবে। ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। একসঙ্গে তিনটে পাল তুলে চলেছে মহাজনী নৌকো। জ্বলন্ত আকাশের গায়ে ছইয়ের মানুষটিকে মনে হচ্ছে কাঠকয়লার মূর্তি।

মাঝে-মধ্যে হঠাৎ কোনও প্রৌঢ়ের দর্শন মিলে যেত। দুগ্ধ শুভ্র ফিনফিনে পাঞ্জাবি। দুগ্ধশুভ্র চুল। মাঝখানে সিঁথি। খাড়া নাকে এক ধরনের শেষ বেলার ঔদ্ধত্য। সামনে লোটানো কালো পাড় ধুতির কোঁচা। পায়ে বার্নিস করা জুতো। ধীর চলন অনেকটা অপগত-জোয়ার নদীর মতো। ভাটার টান ধরেছে। সাগর ডাকছে, 'বেলা শেষ হল, আয় এবার চলে আয়। পড়ে থাক তোর ব্রুহাম গাড়ি। আস্তাবলে ওয়েলার ঘোড়া, জলটুঙ্গিতে সুন্দরী পুত্রবধূ। ঝাড়ে জ্বলে উঠুক সহস্র দীপ। ওই শোনো রাধাকান্ত জিউর মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে টিং টিং করে। জীবন গোধূলিতে প্রস্তুত হও, সব গরুকেই বিচরণের তৃণভূমি ছেড়ে ঘরে ফিরতে হয়।'

শনিবারের রাতে এই সব বাগানবাড়িতে আলোর মালা জ্বলে উঠত। দোতলার হল ঘরের সব জানালা খোলা। সার সার আলোকিত ঝাড়। গেটের বাইরে ছায়া ছায়া রাস্তায় দামী দামী গাড়ী। ফোর্ড, বুইক, স্টুডিবেকার, চেভ্রলে, স্ক্রাইসলার, সানবিম, অস্টিন, মরিস। পেট্রলের গন্ধে গুমোট হয়ে আছে। সালঙ্কারা মহিলারা দোতলার চওড়া বারান্দায় কখনো এসে দাঁড়াচ্ছেন, কখনও ভেতরে চলে যাচ্ছেন। হাস্নুহানার গন্ধে বাতাস মাতাল। হঠাৎ হারমোনিয়ামে ঠুমরির মুখ বেজে উঠল। চড়া পর্দায় বাঁধা তবলায় পড়ল তীক্ষ্ণ চাঁটি। বুলবুল পাখির মতো গানের ছোট ছোট কলি উড়তে লাগল পিয়া বিনা ক্যায়সে রাতিয়া গুজারে। ওদিকে বটতলার কোটরে শিবলিঙ্গের মাথার ওপর মাটির প্রদীপ জ্বলছে কেঁপে কেঁপে। খড়ের চালায় কামার বধূ কাঠের আগুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত বসিয়েছে। পেছন দিক থেকে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে উদোম শিশু ঘুম আর খিদেতে খুঁত খুঁত করছে। দেয়ালে তাদের ছায়া

কাঁপছে বিশাল আকারে। নাটমন্দিরের দোতলায় আস্তানা গেড়েছেন বিন্ধ্যাচলের শৈব-সাধক। একপাশে খাড়া ত্রিশূল। নিমকাঠের কমণ্ডলু। ধূনির আগুনে মুখ টকটকে লাল। জটা পিঙ্গল বর্ণ।

নদী দু ধরনের জীবনধারাকেই প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। ভোগ আর যোগ। রাসমণির কালীবাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ গাইছেন, মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। ঠাকুর ভাবে বিভোর। ওদিকে বাইজি নন্দলালের নাচঘরে।

এক মন্দিরের নির্জন ঘাটে প্রেমিক প্রেমিকার মুখ চুম্বন করছে। হোরমিলারের জাহাজ চলেছে বিশাল চাকায় জল কেটে কেটে যেন আলো স্বপ্ন। ওদিকে মহাশ্মশানে ধূ ধূ চিতা জ্বলছে। তরুণী বধূর হাতের শাঁখা ভাঙা হচ্ছে ঘাটের পইটেতে ইট দিয়ে ঠুকে ঠুকে। নদী আর জীবন-নদী দুয়েরই বিচিত্র ধারা। নীলকণ্ঠ দেখে শুনে গান বাঁধলেন, শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস কখন কি যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। এককূল নদী ভাঙে নিরবধি আবার অন্য কূলে আকূলে সাজায়।

সেই সময়টায় আমি ছিলুম না যে সময়ে চৈতন্যদেব নৌকো করে সপার্ষদ পানিহাটি থেকে এই দিকে এসেছিলেন। একটি কাঁথা ফেলে গিয়েছিলেন কাঁথাধারীর মঠে সেই সময়েও ছিলুম না যে সময় সিরাজ ফিরছিলেন কলকাতা জয় করে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেদিন একই সঙ্গে ঝপ আর বিষয় চিন্তায় রত জয়নারায়ণকে নৌকো থেকে নেমে এসে একটি চড় মেরেছিলেন সে দিনও আমি ছিলুম না। কিংবা হয় তো ছিলুম অন্য নামে, অন্য দেহে। হয় তো বসেছিলুম ঘাটের আর একটি ধাপে, আঁজলায় গঙ্গাজল নিয়ে। সূর্য সেদিনও ডুবছিল আকাশে জবা-কুসুম ছড়িয়ে। এই নদী ওই সূর্য আমার বহু জন্মের সাক্ষী। বহুবার আমাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে। অস্ত অন্ধকারে চোখের সামনে একটি দুটি করে তারার খই ছড়িয়ে দিয়েছে। এক মায়ের কোল থেকে তুলে নিয়ে আরেক মায়ের কোলে ফেলেছে। এক সম্পর্ক ভেঙে আর এক সম্পর্ক গড়ে দিয়েছে। এক এক নামে এসেছি। বইতে বইতে লীন হয়ে গেছি মৃত্যু-সাগরে? আবার এসেছি। মুণ্ডকোপনিষদের শ্লোকটি মনে পড়ছে,

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

কে বলতে পারে বার্নিয়ের যখন পিপ্‌লি থেকে হুগলি আসছিলেন আমি তাঁর নৌকোতে অন্য নামে ছিলুম কি না? ১৬৫৬ সালের কথা। তিনশো তিরিশ বছর হয়ে গেল। কোথায় বার্নিয়েব! কোথায় পিপলিপত্তন! আর আমিই বা কে! উড়িষ্যার উপকূলে, সুবর্ণরেখা নদী থেকে প্রায় ষোলো মাইল দূরে ছিল এই বিখ্যাত বন্দর। ১৬৩৪ সালে পর্তুগীজদের হটিয়ে ইংরেজরা কুঠি স্থাপন করেছিলেন। নদীর খেয়ালে নদী সরে গেল। তাম্রলিপ্তের মতো পিপলিপত্তনের গৌরবও হারিয়ে গেল। সেই আগমন-পথে বার্নিয়ের যা দেখেছিলেন আর কি তা দেখা যাবে? 'যে-নৌকায় আমি

যাত্রা করেছিলাম সেটি একখানি সাত দাঁড় যুক্ত নৌকা।' সাত দাঁড়, তিন দাঁড়, দু দাঁড়, কত রকমের নৌকো ছিল। এখনও আছে। তবে যুগ একেবারে পাল্টে গেছে। ভয় আর রহস্য যেখানে যা কিছু ছিল, মানুষ আর তার যন্ত্র-দৈত্য সব শেষ করে দিয়েছে। বার্নিয়ের দেখলেন, 'বড় বড় রুই মাছের মতন মাছের ঝাঁক তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে জলের মধ্যে এক জাতীয় তিমি মাছ। মাছগুলোর কাছাকাছি নৌকো নিয়ে যেতে বললাম মাঝিদের। কাছে গিয়ে মনে হল, মাছগুলো যেন মড়ার মতন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। দু' চারটে মাছ মন্থর গতিতে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, আর বাকিগুলো যেন দিশাহারা বিহ্বল হয়ে প্রাণপণ লড়াই করছে আত্মরক্ষার তাগিদে। আমরা হাত দিয়েই প্রায় গোটা চব্বিশ মাছ ধরলাম এবং দেখলাম মাছগুলোর মুখ দিয়ে ব্লাডারের মতন রক্তাক্ত এক রকম কি যেন বেরিয়ে আসছে।'

অমন অদ্ভুত মাছ আমি দেখিনি। আমি ইলিশ দেখেছি। বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ ছিল ইলিশের বছর। গঙ্গার ধারে মাইলের পর মাইল টাকী, বসিরহাট, হাসনাবাদ থেকে আসা ইলশে নাওয়ের সারি। আমাদের লাফালাফির শেষ নেই। এ নৌকো থেকে ও নৌকো লাফাতে লাফাতে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠনের সারি মালার মতো লুটিয়ে আছে জলের কিনারায়। হু হু উনুন জ্বলছে। বাতাসে উড়ছে আগুনের ফুলকি। মাঝিদের রান্নার মশলার কড়া গন্ধ। বাঁশে বাঁশে আটকানো জিলজিলে জাল। নদী তখন বড় দয়ালু ছিল। একবার জাল ফেললেই এক কুড়ি রুপোলি মাছ। ইলিশে মানুষের আতঙ্ক ধরে গিয়েছিল। শেষে মাটিতে ইলিশ কবর দেওয়া শুরু হল। কোথায় সেই তপসে, ভাঙড়, দাড়িঅলা কাদা চিংড়ি। পেঁয়াজের সঙ্গে শিলে বেটে ঝালদার চিংড়ির চপ।

জনপদের যত আবর্জনা, কলকারখানার পরিত্যক্ত বিষে পুণ্যতোয়া জরজর। সমুদ্র থেকে ইলিশ আর উঠে আসে না মিঠেপানির লোভে। ঈশ্বর গুপ্ত নেই তপসেও নেই। প্রাণী না থাক নদীর প্রাণ এখনও আছে। প্রবাহিতা। সময়ের জোয়ার ভাটা খেলে। প্রাণ হরণের ক্ষমতাও আছে এই তো সেদিন এক নৌকো জীবন গ্রাস করেছে। বিসর্জিতার জন্যে পেতে রেখেছে গৈরিক বুক। লক্ষ লক্ষ উত্তাল বাহুর আঘাতে পুবপাড়ের সব বাগানবাড়ি ভাঙতে শুরু করেছে। পোস্তা খন্ড খন্ড। জলটুঙ্গি কাত। সেই সুন্দরী মহিলা, শুভ্র কেশ অভিজাত বৃদ্ধ সময়ের ট্রেন ধরে চলে গেছেন অন্য স্টেশনে?

ক্যালেন্ডারে উনিশশোতিরাশি। ঘড়ির কাঁটা সহস্র কোটীবার পাক মেরেছে। পৃথিবী আরও বৃদ্ধ হয়েছে। বটবৃক্ষের আরও ঝুরি নেমেছে। শৈশবের আমি প্রৌঢ় আমি হয়ে বসে আছি ভাঙা বেদিতে। এখন আর ইলিশের চিন্তা নয়। পূর্ণ চন্দ্রের রাত। বসে আছি সেই আশায়। দেখতে চাই বার্নিয়ের যা দেখেছিলেন, চাঁদের রামধনু। 'চাঁদের বিপরীত দিকে ঠিক দিনের আলোর রামধনুর মতো উদ্ভাসিত। আলো যে খুব উজ্জ্বল সাদা তা নয়। নানা রঙের ছটা তার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায়। সুতরাং আমি প্রাচীনদের

চাইতে অনেক বেশি ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ দার্শনিক আরিস্ততেলের মতে, তাঁর আগের যুগের কেউ চাঁদের রামধনু চোখে দেখেনি কোনোদিন।' বহু রাত জেগেছি নদীর ধারে। নদী কখনো কাঁদে, কখনো হাসে, কখনো তার নাভিদেশ থেকে ওঁকার ধ্বনি ওঠে। নদী ডাকে, আয় চলে আয়।

Sunset and evening star
And one clear call for me

প্রথম পাখি উঠল ডেকে। ভোরের আর দেরি নেই। অন্ধকারে ফাটল। একটু পরেই ফুটবে দিনের ছবি।

তিন

'ভয় নেই তার
জীবনে যে তার সমুদ্র উর্মিল
সে তো মরা নদী মজা খাল নয় জোয়ার-ভাঁটায় নীল
সমুদ্র সে যে মুক্ত সে নির্ভীক'

আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। পাকা চুল। দৃষ্টি ক্ষীণ। বিরাট একটা বাড়িতে একা থাকি ভূতের মতো। এখন পালা শেষ। পুরনো মঞ্চে ছেঁড়াখোঁড়া, ধুলো ভরা, ভেলভেটের পর্দা ঝুলছে। মঞ্চের পাটাতনে ঘুণ ধরেছে। উইংসের অল্পকার কোণে কোণে ইঁদুরের নাচানাচি। পালাটা জমেছিল ভালই ; তবে ছোট।

এই কদিন আগে আমি সমুদ্রে গিয়েছিলুম। ট্যুরিস্ট স্পট নয়। একেবারে নির্জন। জায়গাটার একমাত্র আকর্ষণ, সেখানে পরিত্যক্ত একটা বাতিঘর আছে। চারপাশে বালির ঢেউ। সমুদ্র সরে গেছে দূরে। দূরে ঢেউয়ের পর ঢেউ অশান্ত উচ্ছ্বাসে তটভূমিতে নিজেদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। সমুদ্রের শ্বাস-প্রশ্বাসের বিপুল শব্দ। ঝিনুকের পুরনো খোলা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। জাহাজের ভাঙা টুকরো। মরচে ধরা নাট বল্টু। বালি মাখা জাহাজের দড়ি, নুনে জরে আছে।

আমি প্রায়ই আসি। জমজমাট বন্দর এলাহি ব্যাপার নিয়ে অনেক দিন হল সরে গেছে অন্য সমুদ্রে। তৈরি হয়েছে নতুন নগর সেখানে। এখানে সম্রাটের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাতিঘর। দিশারী আলো আর সারা রাত চমকায় না। গোল ঢাকনা বইয়ের মলাটের মতো ঝুলে আছে। বাতাসে হাততালি দেয়।

প্রাচীনকালের কয়েকটা ব্যারাক অতীত আঁকড়ে পড়ে আছে। পুরনো দিনের সমৃদ্ধির কথা গল্প করার জন্যে। বাতিঘরের গায়ের ডোরা কাটা উজ্জ্বল রঙ সমুদ্রের

নোনা বাতাসের ঘর্ষণে উঠে উঠে গেছে। দরিদ্র রাজার রেশমী আচকানের মতো। মাথার ডোমে মাঝে মাঝে চিল এসে বসে। অনেকটা দূরে সমুদ্রের হাহাকার।

এক বৃদ্ধ গোয়ানিজ দম্পতি এই জায়গার মায়া ছেড়ে যেতে পারেনি। সুদূর অতীতে বাবা আর মায়ের হাত ধরে ছেলেটি এখানে এসেছিল। বাবা ছিলেন ওই বাতিঘরের ক্যাপ্টেন। এই সমুদ্র ছেলেটিকে বড় করল। তিন মাইল দূরে শহর। সেখানে আছে সেন্ট জোসেফস স্কুল আর কলেজ। ছেলেটি মেধাবী। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হল। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ এল বারে বারে। সে গেল না। স্থানীয় একটি মেয়েকে বিয়ে করল। স্থাপন করল ছোট্ট একটি স্কুল। ফিশার মেনস স্কুল।

আগে এই জায়গাটা ছিল মাছধরার বিশাল এক ঘাঁটি। সমুদ্র ডাঙার দিকে টন টন মাছ ছুড়ে দিত। সেই সমৃদ্ধিরও আমি সাক্ষী। আমার দিদি বলত, 'খোকা! সমুদ্রকে ভালবাসলে মৃত্যুকে জয় করতে পারবি। লবণই জীবন। লবণেই স্বাদ। সমুদ্র লবণে ভরা।' আমার দিদি ছিল সাহিত্য আর দর্শনের নামকরা ছাত্রী। এস্রাজ বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত। সবাই অবাক হয়ে শুনত। বারে বারে বলত, তুমি গানের লাইনে গেলে না কেন?

অসাধারণ স্মৃতি ছিল তার। বড় বড় কবিতা একবার দুবার পড়লেই তার মুখস্থ হয়ে যেত। আজও দেখতে পাই, জানলার দিকে পেছন ফিরে বসে সে আবৃত্তি করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। নতুন পাতা এসেছে গাছে, গাছে। পৃথিবীর সবুজ-সম্রাট। আকাশের নীল-চাঁদোয়ার তলায় হরিতের মহোৎসব। দিদি বসে আছে সবুজ আলোর আভায়। ফুর-ফুরে চুল উড়ছে মৃদু-মৃদু বাতাসে। আমার দিদি আমার দেবী। সর্ব অর্থে এমন পরিচ্ছন্ন মেয়ে আমি আর দুটি দেখিনি। দিদি আবৃত্তি করছে। পাশে শুয়ে আছে তার এস্রাজ। কবিতার সেই লাইন কটা আমার মনে গিঁথে গিয়েছিল:

> আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
> শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
> কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন
> আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
> নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে,

অনেকে অনেক রকম দীক্ষা পায়। দিদির কাছে আমি পেয়েছিলুম সমুদ্র-দীক্ষা। সদা চঞ্চল। কখনো পান্নার মতো সবুজ। নীলার মতো নীল। ভেঙে পড়ার ঢেউয়ের ঠোঁটে শিশুর মতো ফেনার হাসি। সহস্র, সহস্র গোপাল হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। শঙ্খচিল হয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশে।

দিদিই আমাকে বলেছিল, 'তুই ওসানোলজি পড়।' ওসানোলজিস্ট-এর অধ্যাপক হয়ে জীবনে কত সমুদ্দুরই না দেখা হল! সাত সমুদ্র তের নদী। সমুদ্র কেন সরে যায়! কেন এগিয়ে আসে! কেন বদলে দেয় পৃথিবীর আবহাওয়া! বরুণ রাজার কত সম্পদ পড়ে আছে সমুদ্রের তলায়! তখন কাজের সূত্রে এসেছিলুম এই জায়গায়।

তখনও ছিল সব কিছু। বাতিঘর সারারাত বাতি ঘোরাত সমুদ্রের বুকে, দিশাহারা নাবিককে দিত আলোক-ইশারা। আবহাওয়া অফিস ছিল। দুধসাদা বাড়ি। একেবারে ওপরে, হাওয়া-মোরগ। পাশেই উড়ছে হাওয়া-ফানেল। কখনো বাতাস-পরিপূর্ণ। উড়ছে বাতাস-প্রবাহে। কখনো বাতাস-শূন্য। চুপসে ঝুলে আছে। আমার অন্বেষণ ভিন্ন। সমুদ্র কোথা থেকে কী নিয়ে এসে তটভূমিতে জমা করে দিয়ে যাচ্ছে? কেন তার স্রোত ঘুরে যাচ্ছে।

এক দুঃসাহসী পর্তুগিজ নাবিক আমার জন্যেই যেন এখানে ছোট্ট একটি বাংলো রেখে গিয়েছিলেন। রেখে গিয়েছিলেন, যীশুর বিশাল ছবি ও ক্রুশ। আমাকে দেখাশোনার জন্যে এক যুবককে পেয়েছিলুম। তার নাম ছিল ইসমাইল। ধার্মিক ছেলে। সূফী। প্রেমিক। তার সংসার ছিল না। সে-ও সমুদ্র-প্রেমিক। দু'জনে জমেছিল ভাল।

প্রথমদিনের ক্লাসে, প্রথম লেকচার আজও ভুলি নি। সম্মানীয় অধ্যাপক এই বলে শুরু করলেন, 'Ours is indeed the watery planet ; there is no other like it in the solar system.' আমাদের পূর্বপুরুষরা এই গ্রহের যতটুকু জেনেছিলেন। তাতে তাঁদের ধারণা হয়েছিল, পুরোটাই স্থল। পাথর আর মাটি। এদিকে ওদিকে সামান্য জল। একটি হল ভূমধ্যসাগর, অন্যটি কৃষ্ণসাগর। আর অতলান্তিক হল। একটি সঙ্কীর্ণ নদী পৃথিবীর কানা বেড়ে বহে চলেছে। তাঁরা যদি জানতে পারতেন, এই গ্রহের সত্তরভাগই জল। তাহলে এর নাম আর্থ না রেখে, রাখতেন ওসান।

আমরা একটু নড়ে চড়ে বসলুম। কোটি কোটি মানুষের জন্যে মাত্র তিরিশভাগ স্থল! বাকিটা সাগর! লবণাক্ত জল। বহু ধরনের লবণ, খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত। সব গুলে একাকার। বাতাস থেকে নেমে এসেছে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন।

আমাদের অধ্যাপক পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে যেতেন। সৃষ্টির কি বিস্ময়! সামুদ্রিক প্রাণীরা ওই দ্রবীভূত অক্সিজেনে শ্বাসকার্য চালায়। সমুদ্রের তলার গাছপালা দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে খাদ্য তৈরি করে তাদের রান্নাঘরে। আর দ্রবীভূত নাইট্রোজেন হল পুষ্টি। বাড়তে সাহায্য করে। ইসমাইল আমাকে সূফীদের গল্প করত। সে এক অপূর্ব আস্বাদ। সমুদ্র তখন কাছে। অবিরল ঢেউ ভাঙার শব্দ—ঝপাৎ, ঝপাৎ। বাইরে নিশকালো অন্ধকার। নিচে সমুদ্র। পিল পিল করে আসছে ফসফরাস ঢেউ। আকাশে অসহায় তারা। নাবিকের বন্ধু ধ্রুবতারা। সপ্তর্ষিমণ্ডল। কালপুরুষ কুকুর নিয়ে বেরিয়েছে নভোমণ্ডলের তদারকিতে। কেবিন ঘরের খোলা জানলা দিয়ে আসছে উড়ে বাতাস। সব ভিজে ভিজে হয়ে যাচ্ছে। ইসমাইল আমার বন্ধু। সে আমাকে গল্প বলছে, 'হজরত মোহাম্মদ বলতেন, হে প্রভু! তুমি আমাকে একবেলা খাইয়ে রেখো যেন আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আর একবেলা অনাহারে থেকেও

আমি যেন অধৈর্য না হয়ে পড়ি। তিনটি জিনিস ছাড়া মানুষের আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। প্রথম প্রয়োজন, বসবাসের জন্যে একটি ঘর। দ্বিতীয় প্রয়োজন, পরার জন্যে কয়েকটি কাপড়। তৃতীয় প্রয়োজন, জীবন ধারণের জন্যে সামান্য খাদ্য। বাকি সব ঝুট হ্যায়।

'বাবা গঞ্জেশকর একজন বড় সাধক ছিলেন। তাঁর দরবারে যে-কজন শিষ্য থাকতেন তাঁরা সবাই এই কঠোরতা অভ্যাস করে ফেলেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন দিনের পর দিন অনাহারে থেকে উপাসনা করতেন। খাজা নিজামুদ্দিনের মনে শান্তি ছিল না। পড়ালেখা ত অনেক হল, ঈশ্বরের দেখা কবে পাবেন। খাজা গঞ্জেশকারের কারামতের কথা তাঁর কানে এসেছে, দেখা হচ্ছে কই! দিনের পর দিন, কতদিন চলে গেল।

'একদিন ভোরবেলা নিজামুদ্দিন বসে আছেন আজানের অপেক্ষায়। আকাশের গায়ে অন্ধকার তখনো লেগে আছে। এমন সময় মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এল আজানের বাণী, "ইমানদারদের কাছে কি সেই সময়টি এখনও আসেনি যে তাঁদের অন্তর আল্লাহ্‌র জিকরে ঝুঁকে পড়বে?"

'এই ছোট্ট একটি আয়াত ; কিন্তু কি তার তেজ! কি তার আঘাত! নিজামুদ্দিন ভোরের নামাজ শেষ করেই বেরিয়ে পড়লেন। হাতে একটাও পয়সা নেই। খিদে পেলে খাবার কিনে খাওয়ার উপায় নেই। দীর্ঘ পথ। অভুক্ত নিজামুদ্দিন, দীর্ঘ পথশ্রম, কিন্তু ক্লান্তি নেই। তিনি পৌঁছে গেলেন বাবা গঞ্জেশকরের দরবারে।

'বাবা গঞ্জেশকর অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, একজন আসবে। তিনি দেখেই চিনতে পারলেন, এই সে। বাবা গঞ্জেশকর নিজামুদ্দিনকে বললেন, বাবা আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। বড় চিন্তায় ছিলুম, হিন্দুস্তানের বেলায়েত কাকে দেওয়া যায়। বাবা! তোমাকে তখনো দেখতে পাইনি আমার আকাশে। একদিন বসে বসে ভাবছি। ভাবছি, আর একজনের কথা। সঙ্গে সঙ্গে গায়েব থেকে কে যেন বলে উঠলেন, গঞ্জেশকর। আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর। নিজাম বাদাউনিকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। সে আসছে।

'নিজামের চোখে জল। সাধুসঙ্গে এত আনন্দ! গঞ্জেশকর নিজের মাথার টুপি নিজামের মাথায় পরিয়ে দিলেন। তাঁর জুতো আর খেরকাহ দান করলেন নিজামকে। বললেন, আজ থেকে হিন্দুস্থানের বেলায়েত তোমাকে দিলুম। এই দায়িত্ব বড় কঠিন। এস! তোমাকে তৈরি করি।

'শুরু হল সাধনা। অন্তরের প্রদীপ জ্বলবে। অন্ধকার দূর হবে। দীপ, দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ। একেই বলা হয় বাতেনী জ্ঞান মারেফতে। পীর, সূফী-জ্ঞানী মারেফাতের ওস্তাদ। সে কি সাধনা! ঘরে খাবার নেই। নেই ত নেই। জুটলে খাওয়া হবে, নয়ত উপবাস!

'গঞ্জেশকরের শিষ্যরা কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। একজন জঙ্গল থেকে কাঠ

সংগ্রহ করে আনবেন। একজন আনবেন জল, আর একজন সংগ্রহ করবেন তরিতরকারি। আর রান্না করবেন নিজামুদ্দিন।

'একদিন চারজন আহারে বসেছেন। নিজামুদ্দিন ও তাঁর দুই গুরু ভাই একই পাত্র থেকে আহার করতেন। আর গুরু গঞ্জেশকর বসেছেন আলাদা। গুরু গঞ্জেশকর পাত্র থেকে খাবার তুলে মুখের কাছে এনেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত অবশ। তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, এই খাবার থেকে অপব্যয়ের গন্ধ আসছে কেন?'

'নিজামুদ্দিন মাথা হেঁট করে আছেন। শেষে স্বীকার করলেন, ঘরে লবণ ছিল না কারো কাছে। তাই দোকানীর কাছ থেকে এক পয়সার লবণ ধারে আনা হয়েছে। পয়সা হাতে এলেই দিয়ে দেওয়া হবে।

'গঞ্জেশকর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। এ-পথ সূফীদের পথ নয়। সদাসন্তুষ্টি, অভাবকে মেনে নিতে হবে আল্লাহ্‌র দান হিসেবে। মানুষের কাছে হাত পাতবে কেন। দাতা ভগবান। ঋণ, সেতো আরও অন্যায় কাজ। কাল যদি হঠাৎ মারা যাও, কে শোধ করবে তোমার ঋণ! যাও সমস্ত খাদ্য গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দাও।'

'সাধক গঞ্জেশকর অভুক্ত। নিজামুদ্দিনের চোখে অনুশোচনার জল। এ কী ভুল তিনি করলেন। কয়েকটা দিন গভীর অনুশোচনায় কাটল। প্রতিজ্ঞা করলেন, যত কঠিন সমস্যাই আসুক না কেন, জীবনে কখনো ঋণ গ্রহণ করবেন না।

'বাবা গঞ্জেশকর তাঁর প্রধান ও প্রিয় শিষ্যের অনুশোচনা ও প্রতিজ্ঞার কথা জানলেন। দরবারে এসেছেন নিজামুদ্দিন। গঞ্জেশকর তাঁকে বললেন, 'বাবা, সেদিনকার ঘটনায় তুমি দারুণ লজ্জিত, অনুতপ্ত / আল্লাহ্ তোমার তওবা কবুল করেছেন। এই নাও আমার এই কম্বলখানা। জীবনে আর কখনও কোনদিন তোমাকে ঋণগ্রহণ করতে হবে না।'

ইসমাইল শেষে আমার গুরু হয়ে গেল। আমার খুব ভোগবাসনা ছিল। ভীষণ অহঙ্কার। প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষা। একটু একটু করে সব গেল। আমাদের কুঠিয়াতে বড় একটা চুল্লি ছিল। বড় মা আমাকে ভাল, ভাল তরিবাদি রান্না শিখিয়েছিলেন। অমন সুন্দর একটা চুল্লি, আমার নির্দেশে ইসমাইল তন্দুরি রুটি, কাবাব, আরও নানারকম মোগলাই খাবার তৈরি করত। সে কিন্তু খেত না। তার আহার ছিল, ডাল, রুটি আর সবজি। বুঝলাম, এই তার আদর্শ। আমার লজ্জা এল। আদর্শের লড়াইয়ে ইসমাইলের কাছে হেরে যাব! ধীরে ধীরে সব ত্যাগ। খুব সিগারেটের নেশা ছিল। একদিনে ত্যাগ। দামী সিগারেটের প্যাকেট, ভর্তি। সমুদ্রে ফেলে দিলুম। ঢেউয়ের মাথায় চেপে বারে বারে ফিরে আসতে লাগল। শেষে তলিয়ে গেল। আহারও নামিয়ে আনলুম ইসমাইলের ধারায়। ভাত, ডাল, সবজি। এক মাসের মধ্যেই সুন্দর একটা পরিবর্তন এল মনে। আনন্দ এল। ভয় চলে গেল। সব মানুষেরই এক ভবিষ্যৎ—এদিকে শেষে করে ওদিকে শুরু করা। খোলাটা হল এপার-ওপার। এপারেও মা, ওপারেও মা। ওপারে যেই শুরু হল জন্ম-যন্ত্রণা, এপারে মৃত্যু-যন্ত্রণা। সমুদ্রের

ঢেউ যাচ্ছে আর আসছে। কিছু ক্যানা। সেইটাই হল ক্ষণ জীবন। 'ফ্রথ'।

এই সব ভাবনা যত আসতে লাগল, ততই আমি বদলে যেতে লাগলুম। ইসমাইলকে একদিন বললুম, আমি আর একটা জগৎ দেখতে পাচ্ছি। ইসমাইল বললে, তোমার ভেতরে আল্লাহ্‌র নূর জলে উঠেছে। জ্ঞানের আলো। আমি তো মুসলমান নই ইসমাইল। আমার তো ভগবান! ইসমাইল বললে, আল্লা আর ভগবানে কোনো তফাত নেই। ওপরে সব এক।

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে ভোলাময়রার কবির লড়াই হচ্ছে? ভোলা ময়রার আক্রমণ, 'ওরে জাত ফিরিঙ্গি জবরজঙ্গি পারবে না মা তরাতে / তুই যিশুখ্রিস্ট ভজগে যারে শ্রীরামপুরের গির্জাতে॥' অ্যান্টনি উত্তর দিলেন, 'শুরুতে সব ভিন্ন ভিন্ন অন্তিমে একাঙ্গী।' মৃত্যুতে জাত নেই। মৃতের একটাই জাত—মৃত।

ইসমাইলের চেহারা যেমন সুন্দর, সেইরকম সুন্দর তার চরিত্র। সমুদ্র সরে গেল। বন্দরের মানুষে চলে গেল অন্য বন্দরে। যেখানে ভাগ্য সেইখানেই মানুষ। ইসমাইলকে বললুম, 'সবাই ত চলে গেল, তুমি যাবে না!'

ইসমাইল বললে, 'তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব! তুমি যে আমার জন্ম-জন্মান্তরের দাদা।'

পড়ে রইলুম আমরা কজন। সামনে অশান্ত শান্তি। সমুদ্র। মৃত বাতিঘরের প্রবেশদ্বার বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে। বালির পাহাড। বাতিঘরের তলায় বসে বসে আমাদের কত সুখ দুঃখের গল্প। ভেতরে একটা অদ্ভুত শব্দ। কে যেন ক্রেডল ড্রামে বাজাচ্ছে দুটো কাঠি দিয়ে। হঠাৎ শুরু হয়েছে। ইসমাইলই প্রথম শুনতে পেয়েছিল। বাতাসের জোর বাড়লেই, ভেতরের শব্দের জোর বেড়ে যায়।

ইসমাইল বললে, 'কী ব্যাপার বলো তো। দেখতে হচ্ছে। কালই জেলে বস্তি থেকে লোক এনে, বালির পাহাড় সরিয়ে দরজাটা খুলতে হবে। অদ্ভুত শব্দটা হচ্ছে কি করে!'

চার

['একদা দুটো ব্যাং একটা ননীর পাত্রে পড়ে গিয়েছিল। আর উঠতে পারছে না। দুটোতেই সেই ননীতে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটছে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। পারছে না। একটা ব্যাং ক্লান্ত হয়ে বললে-নাঃ, মুক্তির আশা নেই। ভাই! আমি মরে যাই। দ্বিতীয়টা হাল ছাড়ল না। ঘুবছে, ধুরছে। ননী এই মন্থনের ফলে হয়ে গেল এক ডেলা মাখম। ব্যাং সেই মাখমের তালের ওপর উঠে এক লাফে বাইরে। মুক্তি।']

এ এক অদ্ভুত জায়গা। কখনো ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর, কখনো মেঘ কালো। কালো আকাশের তলে ধুধু সাদা বালি। তখন সাদা সাদা সামুদ্রিক চিলগুলোকে সুখ-স্বপ্নের মতো মনে

হয়। আমার ছাত্রজীবনের প্রিয় বন্ধু গোপাল কবিতা লিখত। ভারি সুন্দর কবিতা। আমার ঈর্ষা হত। ভাব আসে, ভাবনা আসে, কবিতা কেন আসে না! গোপালের মনটা ছিল সন্ন্যাসীর। কামনা-বাসনা-উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছুই ছিল না। অতি অল্প বয়সে বাবা মারা গিয়েছিলেন। সংসার চালাবার জন্যে, ভাই-বোনদের মানুষ করার জন্যে এক সময় গামছা বিক্রি করেছে। মান-অপমানের ধার ধারে না। আমাকে বলত, ধন-সম্পত্তি না বাড়িয়ে জ্ঞান বাড়া। গোপাল খুব ভাল পড়ুয়া। প্রখর স্মৃতি শক্তি। আদর্শবান, একরোখা, পরোপকারী। অন্য লোকে কী বলছে তোমার দেখার দরকার নেই। তুমি তোমার সম্পর্কে কী বলছ, সেইটাই বড় কথা। এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। নিজেকেই নিজে সামলাও। সুন্দর এক উদ্যানে বেড়াতে এসেছ।

যার ঠিকানা নেই তার
পথ কি হারায়।
ধরনি যার পেতেছে কোল
কেউ ডাকে না ডাকে তার
কি আসে যায়!
এসে ছিল যে শূন্য হাতে
ভয় সে কি পায় রিক্ত হতে!

বাতিঘরের সামনে অনেক লোকজন। বেলচা, কোদাল। খুব উত্তেজনা। বালি সরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে, কী আছে! কিসের শব্দ। সামুদ্রিক রোদে চারপাশ জ্বলছে। মাঝে মাঝে নোনা বাতাসের ঝাপটা। এক সময় আমি ফর্সা ছিলুম, এখন রোদে পুড়ে তামাটে।

তিন ঘন্টার চেষ্টায় দরজা খোলা গেল। একটা সিঁড়ি গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে গেছে। ভেতরটা মাকড়সার ঝুলে ভরা। বাতাসে ছিঁড়ে খুঁড়ে জায়গায় জায়গায় ঝুলে আছে। ভেতরে ঢুকে আমরা ওপরে তাকালুম। ফোকর দিয়ে রোদ ঢুকছে। আলো-ছায়ার খেলা। দেখবার মতো। আলোর ফিতে ঘুরে ঘুরে নামছে নিচে।

অনেক উঁচুতে বিরাট একটা পুতুলের মতো কি দুলছে। কয়েকজন উঠে গেল ওপরে। চিৎকার করে জানাল, একটা কঙ্কাল ঝুলছে। বাতাসে তার অসংলগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন দুলছে, তখনই বাজনার মতো শব্দ হচ্ছে নানা রকম তালে। হাড়ের বাদ্য। বড় অদ্ভুত!

শুরু হল গবেষণা। কে আত্মহত্যা করল ওই অদ্ভুত জায়গায় উঠে! সে কত বছর আগে! একটা দেহ কঙ্কালে পরিণত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। কেউ কি কঙ্কালটাই ঝুলিয়ে রেখে গেছে! কঙ্কালটাকে খুব সাবধানে নামিয়ে আনা হল। পরিচয়হীন মানুষের কাঠামো শুয়ে আছে বালির ওপর। তুমি কে? তুমিই জানতে তুমি কে? প্রায় ছ'ফুট লম্বা এক শক্ত-সমর্থ মানুষের কাঠামো। খানিক অনুসন্ধান হল, সমুদ্রের ধারের এই